অধ্যাপক গোলাম আযম

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পলাশী থেকে বাংলাদেশ

অতীতকে বাদ দিয়ে যেমন বর্তমানকে বুঝতে পারা যায় না, তেমনি বর্তমানের বিশ্লেষণ ছাড়াও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে যে নতুন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দুনিয়ার মানচিত্রে স্থান লাভ করল, তার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এখানে বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। এজন্য প্রাচীন কাল থেকে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তাই বৃটিশ শাসনের সূচনা থেকেই শুরু করছি।

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব

১৭৫৭ সালে স্বাধীন বাংলার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর ইংরেজের সহযোগিতায় নিজে নওয়াব হওয়ার যে কুমতলব করেছিল, তারই ফলে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয়। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতার জন্য আপন দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাকে সংগত কারণেই ইংরেজরাও বিশ্বাস করতে পারল না। এভাবেই মীর জাফরের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করা হলো।

১৮৫৭ সালে দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংরেজ রাজত্ব গোটা ভারত উপমহাদেশে মযবুত করা হলো। এভাবে উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে একশ' বছর লেগে গেল। এভাবেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে পরাধীনতার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তা একশ' বছরে বিরাট মহীরুহে পরিণত হলো।

১৮৩১ সালে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের সীমানায় বালাকোটের যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (র.) ও শাহ ইসমাঈল (র.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের প্রথম সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের পরাজয়ের পর

ইংরেজদের শক্তি আরও বেড়ে গেল। কিন্তু এ ইসলামী আন্দোলনের ফলেই ১৮৫৭ সালে ইংরেজ বাহিনীতে নিযুক্ত মুসলমান সিপাহীরা বিদ্রোহ করার প্রেরণা লাভ করেছিল।

এর পরের ইতিহাস মুসলিম জাতিকে চিরতরে গোলাম বানাবার জন্য ইংরেজদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। এ উপমহাদেশে প্রায় ৬০০ বছর মুসলিম শাসন চলেছে। তাদের হাত থেকে পূর্ণ ক্ষমতা কেড়ে নিতে ইংরেজদের ১০ বছর লেগেছে। তাই দিল্লী দখলের পর এদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ইংরেজরা মুসলমানদেরকে সকল ময়দান থেকে উৎখাত করে অমুসলিম জাতিগুলোকে শিক্ষা, সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমিদারীতে এগিয়ে দিল। ফলে ৫০ বছরের মধ্যে এদেশের মুসলিম শাসক জাতি, দাস জাতিতে পরিণত হয়ে গেল। ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টারের "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" বইটি এ কথার বিশ্বস্ত সাক্ষী।

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব

বাংলাদেশ থেকে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ায় বাংগালী মুসলমানরা প্রায় দু'শ' বছর ইংরেজের গোলামী করতে বাধ্য হয়। ইংরেজের মুসলিম দমন নীতির ফলে বাংগালী মুসলমানরা দু'ধরনের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। একদিকে তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে ইংরেজের অধীন হয়ে পড়ল, অপরদিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এদেশেরই ঐ সব অমুসলিমের পদানত হতে বাধ্য হলো যারা ইতঃপূর্বে মুসলমানদের প্রাধান্য মেনে চলত। অমুসলিম জমিদারদের অত্যাচারে ও সুদে টাকা লগ্নিকারীদের শোষণে মুসলমানদের যে কী দুর্দশা হয়েছিল। সে কথা একালের মুসলমানরা ধারণা করতেও অক্ষম।

স্বাধীনতা আন্দোলন

শিক্ষায়-দীক্ষায়, ধনে-দৌলতে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অমুসলিম জাতিগুলো অগ্রসর হবার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পরিচালনায় ও অমুসলিম নেতৃত্বে যখন দেশকে ইংরেজের গোলামী থেকে স্বাধীন করার আন্দোলন শুরু হলো তখন অর্ধমৃত অবস্থায়ও মুসলিম জাতি তাতে সাড়া দিল। ইংরেজ বিদ্বেষ তাদের মজ্জাগত ছিল। কারণ তাদের হাত থেকেই ইংরেজরা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন যে, এ স্বাধীনতা দ্বারা ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি পেলেও মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের অধীন হয়েই থাকতে হবে। গোটা ভারতে তখন ৪০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১০ কোটি মুসলমান ছিল। তাই গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলেও সংখ্যালঘু মুসলমানরা চিরদিনই অমুসলিমদের অধীন হয়েই থাকতে বাধ্য হতো।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার যখন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা কায়েম করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে স্বায়ত্ত শাসনের নামে আংশিক ক্ষমতা তুলে দেবার ব্যবস্থা করল, তখন মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করে কিছুটা আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করল। মুসলিম জনগণের প্রতিনিধি যাতে শুধু মুসলিমদের ভোটে নির্বাচিত হতে পারে, সে ব্যবস্থার নামই পৃথক নির্বাচন। যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় মুসলিম ও অমুসলিমদের মিলিত ভোটে নির্বাচন হলে কংগ্রেসের অমুসলিম নেতাদের মরযী অনুযায়ী কিছু সংখ্যক মুসলিম আইনসভায় নির্বাচিত হলেও জাতি হিসাবে মুসলিমদের কোন পৃথক সত্তা থাকবে না আশংকা করেই মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন দাবি করেছিল।

১৯৩৫ সালের ঐ আইন অনুযায়ী ১৯৩৬ সালে যে নির্বাচন হয়, তাতে ভারতের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হয়। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু ছিল বলে অবিভক্ত বাংলাসহ ৪টি প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি

থাকায় আনুপাতিক হারে এ চারটি আইনসভায় মুসলিম সদস্য সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে বেশি হয়।

মি. জিন্নাহ মুসলিম জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মুসলমানরা তাঁকে কায়েদে আযম (শ্রেষ্ঠ নেতা) হিসাবে বরণ করে নেয়। তাঁরই নেতৃত্বে এবং মুসলিম লীগের উদ্যোগে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হকই ঐ সম্মেলনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলো নিয়ে ভারত থেকে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন, যা সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবটিই ইতিহাসে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

১৯৪৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ও ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলিম লীগ ঐ পাকিস্তান প্রস্তারকেই নির্বাচনী ইস্যু বানায়। সারা ভারতে মুসলিমগণ একটি পৃথক জাতিসত্তার মর্যাদা সহকারে ঐ নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি না থাকলে এ বিজয় কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। এ বিজয়ের ফলে বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার পাকিস্তান দাবী মেনে নেয় এবং ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলাম

"পাকিস্তানের অর্থ কী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। এ শ্লোগানই মুসলমানদের এ আন্দোলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এমন কি ভারতের যে ৭টি প্রদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে জানাই ছিল, সেখানেও মুসলমানরা ইসলামের আকর্ষণে পাকিস্তানের দাবীকে নিরংকুশভাবে সমর্থন করেছে। এর পরিণামে লক্ষ লক্ষ মুসলমান শহীদ হয়েছে এবং জন্মভূমি ও সহায়-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা তাদের ঐ "অন্যায়ের কঠোর শাস্তি" এখনও ভোগ করে চলেছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, "পাকিস্তান আন্দোলন" ইসলামের নামে চলা সত্ত্বেও তা "ইসলামী আন্দোলন" হিসাবে গড়ে উঠেনি। পাকিস্তান কায়েম

হবার পর স্বাধীন মুসলিম দেশটিতে ইসলামী আইন, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা চালু করার কোন পরিকল্পনাই আন্দোলনের নেতারা করেননি। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে। যারা ইসলামকে জানেন না বা যারা নিজের জীবনেই ইসলাম মেনে চলেন না, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে কী করে ইসলাম কায়েম করবেন? ইসলামের ব্যাপারে এ ধোঁকাবাজি করার ফলে নেতারা অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা হারালেন। সেনাপতি আইয়ুব খান সে সুযোগে ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করলেন।

আইয়ুব খানের যুগ

আইয়ুব খান জাঁদরেল শাসক ছিলেন। মুসলিম লীগের নামেই তিনি রাজত্ব করেছেন। অথচ তিনি তাঁর শাসনকালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে একনায়কত্বই চালিয়ে গেছেন। গণতন্ত্রকামী সব দলের সাথে মিলে জামায়াতে ইসলামী আইয়ুব আমলের দশ বছর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে আগা-গোড়াই সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাস থেকে জামায়াতের এ বলিষ্ঠ ভূমিকা মুছে ফেলার সাধ্য কারো নেই।

আইয়ুব খান জামায়াতে ইসলামীর উপর সবচেয়ে বেশি ক্ষেপা ছিলেন। কারণ জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার সাথে সাথে আইয়ুব খাঁর ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতো। তাই ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলাকালে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং ৬০ জন জামায়াত নেতাকে জেলে আটক করা হয়। ৯ মাস পর সুপ্রীম কোর্ট রায় দেয় যে, জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করাটাই বে-আইনী হয়েছে।

সরকারি অবহেলার ফলে ইসলামী চেতনা ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ তো আইয়ুব আমলের পূর্ব থেকেই লোপ পাচ্ছিল। আইয়ুব আমলে ভাষা ও এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তা শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এলো। পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও ভৌগোলিক দিক দিয়ে এক সাথে থাকায় এবং ভারতের সাথে কয়েক দফা যুদ্ধ হওয়ায় সেখানে মুসলিম ঐক্যবোধ কোন রকমে বেঁচে রইল।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ভৌগোলিক দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিসের ভিত্তিতে এখানকার মানুষ পশ্চিমের সাথে একাত্মতা বোধ করবে? ইসলামই একমাত্র সেতুবন্ধন হতে পারতো। কিন্তু সরকারি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে কোন স্থানই দেয়া হলো না। যে মুসলিম জাতীয়তার চেতনা গোটা উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে ১৯৪৬ সালে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, সে চেতনা বাঁচিয়ে রাখারও কোন প্রচেষ্টা দেখা গেল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হবার মাত্র ১০/১৫ বছর পর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একথা জানারও সুযোগ রইল না যে, ভারতবর্ষ দু'ভাগ কেন হলো? পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার মাতৃভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা কেন দু'ভাগ হলো? বাংলাভাষী অমুসলিমের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে কেন বেশি আপন মনে করতে হবে? ফলে ঈমানভিত্তিক জাতীয়তাবোধ বিনষ্ট হয়ে এলাকা ও ভাষাভিত্তিক ঐক্যবোধ জন্ম নিল এবং বাংলাভাষী অঞ্চলে স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ অবধারিত হয়ে উঠল।

রাজনৈতিক ময়দানে যে আদর্শিক শূন্যতা সৃষ্টি হলো সেখানে সমাজতন্ত্র এগিয়ে আসার সুযোগ পেল। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে যাতে ইসলামের কোন প্রভাব না পড়ে, সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ময়দান দখল করতে এগিয়ে এলো। এভাবে এলাকা ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক অংগনে মুসলিম জাতীয়তার স্থান দখল করতে লাগল।

মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগের রাজনৈতিক পরিণাম

মুসলিম জাতীয়তাবোধ চল্লিশের দশকে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী দশ কোটি মুসলমানকে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিল। এরই সুফল হিসাবে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ঐ জাতীয়তাবোধকে লালন না করার ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ এসে পূরণ করল।

যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ মুসলিম জাতীয়তার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাকেই রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেন, তারা স্বাভাবিক কারণেই নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতি করার অযোগ্য হয়ে পড়লেন। কারণ, পাঠান জাতীয়তার পতাকাবাহী নেতা বাংলাভাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সিন্ধী জাতীয়তাবাদী নেতা পাঠানদের নেতা বলে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়। তেমনি বাংগালী জাতীয়তাবাদ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তে রাজনৈতিক আদর্শ বলে গণ্য হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং স্বাভাবিক রাজনৈতিক বিবর্তনেই আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ হয়ে যাবার পর তাদের রাজনীতি পাকিস্তানভিত্তিক না হয়ে শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। গোটা পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে চিন্তা করার পরিবর্তে তাদের সকল পরিকল্পনা শুধু বর্তমান 'বাংলাদেশ' এলাকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল।

কিন্তু যারা রাজনীতি করেন, তারা অবশ্যই ক্ষমতায় যেতে চান। ক্ষমতাসীন না হয়ে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিই বাস্তবায়ন করা যায় না। সুতরাং যারা শুধু পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিলেন,

তাদের ক্ষমতায় যেতে হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

ওদিকে মি. ভুট্টোও ক্ষমতার জন্য পাগল হয়ে একই দেশে দু' মেজরিটি দলের অদ্ভুত দাবি তুললেন। দেশ ভাগ না হলে ভুট্টোরও ক্ষমতাসীন হবার কোন উপায় ছিল না। ভুট্টো ক্ষমতায় যাবার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে যে ষড়যন্ত্র করলেন, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়া ত্বরান্বিত হয়ে গেল।

ইয়াহইয়া খানের সামরিক শাসন

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে প্রচণ্ড গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করে সেনাপতি ইয়াহইয়া খানকে সামরিক আইন জারী করার সুযোগ করে দিলেন। আইয়ুবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দশ বছর ধরে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল এর ফলে বিনা নির্বাচনে আর দেশ শাসন সম্ভব ছিল না। তাই ইয়াহইয়া খান সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করলেন। সমগ্র অবিভক্ত পাকিস্তানে এটাই প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন।

যে টু-নেশন থিউরী ও পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছিল এবং যে মুসিলম ঐক্যবোধের ভিত্তিতে পশ্চিমের ৪টি প্রদেশের সাথে পূর্ব বাংলাকে মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়েছিল, সে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার কোন সরকারি প্রচেষ্টা না থাকায় পাকিস্তান কায়েমের ২৪ বছর পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তার ফলাফল দেখে বুঝা গেল যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান ৩ ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

বাংলাদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, সিন্ধু ও পঞ্জাবে মি. ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টি এবং বাকী দুটো প্রদেশে অন্য দুটো দলের নিরংকুশ বিজয় একথা প্রমাণ করল যে, পাকিস্তানের ঐক্যের ভিত্তি আর বেঁচে নেই। যে ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, সে ভিত্তি না থাকায় নির্বাচনের মাধ্যমেই পাকিস্তানের ভিত্তি ভেংগে গেল।

নির্বাচনের পর

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভায় আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ায় শেখ মুজিবকে ইয়াহইয়া খান পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে মন্তব্য করা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকলেন। ওদিকে ভুট্টো "এধার হাম, ওধার তুম" বলে এক দেশে দুটো মেজরিটি পার্টির অদ্ভুত শ্লোগান তুললেন। বুঝা গেল যে, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের বাদশাহ হতে চান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আলাদা না হলে সে সুযোগ তার হয় না। তাই ইয়াহইয়া খানের সাথে যোগসাজশ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

সে সময় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বার বার জোর দাবি জানানো হলো যে, "ব্যালটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংখ্যাগুরু দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হোক।" কারণ, জামায়াত আংশকা করেছিলো যে, ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব হলে রাজনৈতিক সংকটের সাথে সাথে দেশে চরম বিশৃংখলা দেখা দেবে। সে সময়কার দৈনিক পত্রিকাগুলো জামায়াতের এ দাবির ঐতিহাসিক সাক্ষী।

নির্বাচনের পর ১৯৭১ -এর জানুয়ারিতে লাহোরে মাওলানা মওদূদীর সভাপতিত্বে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যেতে থাকে, তাহলে জামায়াত এর বিরোধিতা করবে না। এ বিষয়ে এখানকার প্রাদেশিক জামায়াতকে যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পূর্ণ ইখতিয়ার দেয়া হলো। এরপর এ সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতই নিতে থাকে।

এরপর যা ঘটল

১লা মার্চ ঢাকায় কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। এ অধিবেশনে ভুট্টো আসতে অস্বীকার করলেন। ভুট্টোর মরযী মত ইয়াহইয়া খান এ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। প্রাদেশিক

সরকার সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌছার কথা ঘোষণা করলেন। ১৯ থেকে ২৩শে মার্চ আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসা না হওয়ায় আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে টিক্কা খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ব্যাপক হত্যা ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অসহযোগ আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করল। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। কয়েক রাতের সামরিক অপারেশনে ঢাকা মহানগরী স্তব্ধ হয়ে গেল এবং রাজধানী তাদের পুনর্দখলে এলো।

ঢাকার বাইরে সব জেলায়ই এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ জেলা ও মহকুমা শহরে অসহযোগ আন্দোলন জারি রাখলেন। ঢাকার বাইরে সেনাবাহিনী এবং পুলিশেও বিদ্রোহ দেখা দিলো। যেসব শহরে অবাংগালী (বিহারী নামে) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল, সেখানে বিহারীদেরকে হত্যা করে ঢাকার প্রতিশোধ নেয়া হলো।

এর প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনী ঐ সব এলাকায় যেয়ে বাংগালী হত্যা করল এবং সরকারি ক্ষমতা বহাল করল। এভাবে দু'দিকের আক্রমণে নিরপরাধ সাধারণ মানুষ নিহত ও অত্যাচারিত হতে থাকল। এক মাসের মধ্যে মোটামুটি দেশে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো বটে, কিন্তু দেশটিকে নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়া হলো।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতে আশ্রয় নিলেন। অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দলের অধিকাংশ নেতাও তাই করলেন। পাক সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে ও অন্যান্য স্থানে হিন্দু বস্তির উপর আক্রমণ করায় তারাও দলে দলে ভারতে পাড়ি জমালেন। পাক সেনাবাহিনীর ভ্রান্তনীতির ফলে দেশের গোটা হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তান বিরোধী হয়ে গেল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী দল পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

মেহেরপুর জেলার মফস্বলে (যে স্থানের বর্তমান নাম মুজিব নগর) আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কায়েম করার পর স্বাধীনতা আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করল, তা কোন বিদেশী সরকারের সাহায্য ছাড়া চলা সম্ভব ছিল না। তাই কোলকাতা থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত হয়।

ভারতের ভূমিকা

পাকিস্তানের চির দুশমন ভারতের সম্প্রসারণবাদী কংগ্রেস সরকার এ মহাসুযোগ গ্রহণ করল। প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত করা হলো। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের গেরিলা ট্রেনিং দেয়া, তাদেরকে অস্ত্র ও গ্রেনেড দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা, রেডিও যোগে প্রবাসী সরকারের বক্তব্য বাংলাদেশের ভেতরে প্রচার করা ইত্যাদি সবই ভারত সরকারের সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতায় চলতে থাকল। রুশ সরকার এ বিষয়ে ভারতের সাথে এক সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং বহু দেশ সফর করে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন যোগানোর চেষ্টা করেন। নিঃসন্দেহে এ সবই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ভারত সরকার তার স্বার্থেই এ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

ভারত বিরোধীদের পেরেশানী

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে যারা ভারতীয় কংগ্রেসের আচরণ লক্ষ্য করে এসেছে, পাকিস্তান কায়েম হবার পর ভারতের নেহেরু সরকার হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর নিয়ে যে হিংস্র খেলা দেখিয়েছেন, মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমিকে পংগু করার জন্য যত রকম প্রচেষ্টা ভারতের পক্ষ থেকে হয়েছে, পূর্ব বাংলার সীমান্ত নিয়ে ভারত বার বার যে ধোঁকাবাজি করেছে, সর্বোপরি ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গংগার পানি আটকে রেখে উত্তরবংগকে মরুভূমি বানাবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে এদেশের কোন সচেতন মুসলিমের পক্ষে ভারত সরকারকে এদেশের বন্ধু মনে করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতা ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাবের দরুন আতংকগ্রস্ত ছিল, তারা মহা-সংকটে পড়ে গেল। তারা সংগত কারণেই আশংকা করল যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে ভারত একদিকে মুসলমানদের উপর "ভারত মাতাকে" বিভক্ত করার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে, কোলকাতার এককালের অর্থনৈতিক পশ্চাদভূমি বাংলাদেশ অঞ্চলকে পুনরায় হাতের মুঠোয় আনার মহাসুযোগ গ্রহণ করছে। এ অবস্থায় ভারতের নেতৃত্বে ও সাহায্যে বাংলাদেশ কায়েম হলে ভারতের আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় হয়তো থাকবে না। বাংলাদেশের চারদিকে ভারতের যে অবস্থান তাতে এ আশংকাই স্বাভাবিক ছিল।

বিশেষ করে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর যে হিংস্র আচরণ অব্যাহতভাবে চলছিল, তাতে প্রত্যেক সচেতন মুসলিমদের অন্তরেই পেরেশানী সৃষ্টি হলো। ভারতের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কারো পক্ষে আতংকগ্রস্ত না হয়ে উপায় ছিল না।

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তারা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজুদ্দীনের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ছাত্র জীবনে আমি তাদের সমসাময়িক ছিলাম। পাকিস্তান আন্দোলনে তাদের ভূমিকা কত বলিষ্ঠ ছিল আমি এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মুসলিম জাতীয়তার পতাকাবাহী হিসাবেই তারা ভারতীয় কংগ্রেসের ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। গান্ধী ও নেহেরুর নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতে একটিমাত্র রাষ্ট্র কায়েমের কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলনে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

তাঁরা ছিলেন তখন তরুণ ছাত্রনেতা। তাঁরা মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত ও অনুরক্ত হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। গোটা বংগদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়ে বৃটিশ শাসকরা পশ্চিম বংগকে পূর্ববংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতে শামিল করার ফলে পূর্ববংগে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব কায়েম হতে পারেনি।

অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগে দুটো গ্রুপ ছিল। এক গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশেম এবং অপর গ্রুপের নেতা ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন ও জনাব নুরুল আমীন। বংগদেশ বিভক্ত না হলে হয়ত সোহরাওয়ার্দীই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন। পশ্চিম বংগ আলাদা হবার ফলে পূর্ববংগে খাজা নাজিমুদ্দীন গ্রুপের হাতেই ক্ষমতা আসে।

শেখ মুজিব ও জনাব তাজুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন নাজিমুদ্দীন গ্রুপের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কোলকাতায়ই রয়ে গেলেন বলে তারা নেতৃত্বহীন অবস্থায় পড়ে গেলেন। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এসে এ গ্রুপের নেতৃত্বের অভাব পূরণ করেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে মুসলিম লীগের বিকল্প দল গঠন করেন। এভাবে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দ্বারাই সরকার বিরোধী দল গঠিত হয়।

সরকারের ভ্রান্তনীতি

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবাহিনী সরকারি ও বিরোধী দলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার যদি ইসলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন, মুসলিম জাতীয়তাকে শুধু শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার না করতেন, গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলতেন এবং অর্থনৈতিক ময়দানে ইনসাফের পরিচয় দিতেন, তাহলে জাতিকে যে ধরনের সংকটের মুকাবিলা করতে হয়েছে তা সৃষ্টি হত না। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সকল ক্ষেত্রেই ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করে দেশকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেন।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ পূর্ববংগের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করতে অস্বীকার করা এবং বাংলাভাষীদের উপর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার ভ্রান্তনীতিই সর্বপ্রথম বিভেদের বীজ বপন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীরা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবি তুলেনি। তারা উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবি জানিয়েছিল।

এ দাবি জানাবার আগেই জনসংখ্যার বিচারে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা সরকারের কর্তব্য ছিল। অথচ দাবি জানাবার পর এটাকে 'প্রাদেশিকতা' বলে গালি দিয়ে সরকার সংগত কারণেই

বাংলাভাষীদের আস্থা হারালেন। ভাষার দাবীটিকে সরকার এমন রাষ্ট্রবিরোধী মনে করলেন যে, গুলি করে ভাষা আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে চাইলেন। এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার জন্ম দেয়।

গণতন্ত্রের প্রশ্নে

গণতান্ত্রিক পন্থায় পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও সরকার অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে টিকে থাকার ষড়যন্ত্র করলেন। শাসনতন্ত্র রচনায় গড়িমসি করে নির্বাচন বিলম্বিত করতে থাকলেন। ১৯৫৪ সালে পূর্বাঞ্চলে প্রাদেশিক নির্বাচনে সরকারি মুসলিম লীগ দলের ভরাডুবির পর কেন্দ্রে ষড়যন্ত্র আরও গভীর হয়। পরিণামে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারী হয়।

আইয়ুব খান গণতন্ত্র হত্যা করার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করলেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে জনগণকে সরকার গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় এবং আসল ক্ষমতা আইয়ুব খানের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে, আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় এবং এর পরিণামে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে। আইয়ুব খানের দশ বছরের শাসনকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব দ্রুত বেড়ে যায়।

অর্থনৈতিক ময়দানে

শাসন ক্ষমতায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং ক্ষমতাসীনদের স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার দরুন শিল্প ও বাণিজ্য নীতি প্রণয়নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে গণপ্রতিনিধি গ্রহণ করার পরিবর্তে সুবিধাবাদীদেরকেই গ্রহণ করা হতো। এর ফলে অর্থনৈতিক ময়দানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে অক্ষম হতেন। এভাবে গণতান্ত্রিক সরকারের অভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকেও আস্থা হারাতে থাকে।

ভুট্টো-ইয়াহইয়া ষড়যন্ত্র

উপর্যুক্ত কারণসমূহ স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি রচনা করলেও ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি এবং অবশেষে দমনমূলক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণই এ আন্দোলনের জন্ম দেয়। নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমি বার বার সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার দাবী জানিয়েছি। জেনারেল ইয়াহইয়া ভুট্টোর দাবী মেনে নিয়ে ১লা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পার্লামেন্ট অধিবেশন মুলতবী করায় চরম রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার মহল্লায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করতেন। ছাত্রজীবনের বন্ধু হিসাবে তাঁর সাথে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল এর সুযোগে তার কাছ থেকে সংলাপের যেটুকু রিপোর্ট পেতাম, তাতে আমার এ ধারণাই হয়েছে যে, সংলাপ ব্যর্থ হবার জন্য ভুট্টোই প্রধানত দায়ী এবং ইয়াহইয়া খান দ্বিতীয় নম্বর দোষী।

নির্বাচনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে আওয়ামী লীগের হাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অর্পিত হতো। সে অবস্থায় পরিস্থিতির চিত্র ভিন্নরূপ হতো। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকায় রাজনৈতিক সমস্যা অবশ্যই দেখা দিত। কিন্তু ৭১-এ যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হলো তা থেকে অবশ্যই রক্ষা পাওয়া যেত। শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টের মাধ্যমেই হয়ত এক সময় দেশ বিভক্ত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ত। ঐ অবস্থায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তার প্রয়োজন হতো না।

বাংলাদেশ আন্দোলনে ইসলামপন্থীদের সংকট

যারা মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিল এবং যারা চেয়েছিল যে, দেশে আল্লাহর আইন ও রাসূলের প্রদর্শিত সমাজ ব্যবস্থা চালু হোক, তারা আরও বড় সংকটের সম্মুখীন হলো। তারা তো স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তের বিরোধী ছিল। তদুপরি স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনকারীদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী চেহারা তাদেরকে চরমভাবে আতংকিত করে তুলল। তারা মনে করল যে, ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও যখন ইসলাম বিজয়ী হতে পারল না, তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা যদি ভারতের সাহায্যে কোন রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে, তাহলে সেখানে ইসলামের বিজয় কি করে সম্ভব হবে?

ভারতে মুসলমানদের যে দুর্দশা যাচ্ছে, তাতে ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ কায়েম হলে এখানেও কোন্ দুরবস্থা নেমে আসে, সে আশংকাও তাদের মনে কম ছিল না।

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের শ্লোগান তুলতেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা যদি তারা না হতেন এবং ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া যদি আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন, তাহলে ইসলাম পন্থীদের পক্ষে ঐ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা খুবই স্বাভাবিক ও সহজ হতো।

ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীদের ভূমিকা

ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীরা উভয় সংকটে পড়ে গেল। যদিও তারা ইয়াহইয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমননীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন, তবুও এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোন সাধ্য তাদের ছিল না। বিরোধিতা করতে হলে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো-যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।

তারা একদিকে দেখতে পেল যে, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহইয়া সরকারকে বিব্রত করার জন্য কোন গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোন পুল না থাকায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাকবাহিনী যেয়ে ঐ গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাতে কোন বাড়ীতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়ীতেই সেনাবাহিনীর হামলা হয়ে যায়। এভাবে জনগণ এক চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলো।

ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীরা শান্তি কমিটি কায়েম করে সামরিক সরকার ও অসহায় জগণের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করার চেষ্টা করলেন, যাতে জনগণকে রক্ষা করা যায় এবং সামরিক সরকারকে যুলুম করা থেকে যথাসাধ্য ফিরিয়ে রাখা যায়। শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে সামরিক শাসকদেরকে তাদের ভ্রান্তনীতি ও অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে ফিরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

একথা ঠিক যে, শান্তি কমিটিতে যারা ছিলেন, তাদের সবার চারিত্রিক মান এক ছিল না। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা সুযোগ মতো অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করেছে।

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা

ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হলেও পাকিস্তানের কোন সরকারই ইলামের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তুলবার কোন চেষ্টা করেনি। জামায়াতে ইসলামী যেহেতু ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচি অনুযায়ী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল, সেহেতু কোন সরকারই জামায়াতকে সুনজরে দেখেনি।

তদুপরি ইসলামেরই নীতি অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য জামায়াতে ইসলামী প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন তুলে নেবার পর আইয়ুবের তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলেছিল, তাতে জামায়াত কোন দলের পেছনে ছিল না।

এভাবেই জামায়াতে ইসলামী আইন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসনের জন্য নিষ্ঠার সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬২ থেকে ৬৯ পর্যন্ত আইয়ুব আমলের আট বছরের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কোন দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়নি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করে ৯ মাস পর্যন্ত ৬০ জন নেতাকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে সরকারের ঐ বে-আইনী ঘোষণাটি বাতিল হয়ে যায়।

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ইসলামী আদর্শ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সংগ্রামেরই গৌরবময় ইতিহাস। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতির ময়দানে যে ভূমিকা পালন করছে, তা সবার সামনেই আছে। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা পাকিস্তান আমলে যেমন স্বীকৃত ছিল, তেমনি বর্তমানেও সর্ব মহলে প্রশংসিত।

৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা

জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমানের ভূমিকা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে জামায়াত আপোসহীন। দুনিয়ার কোন স্বার্থে জামায়াত কখনও আদর্শ বা নীতির সামান্যও বিসর্জন দেয়নি। এটুকু মূলকথা যারা উপলব্ধি করে, তাদের পক্ষে ৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রথমত, আদর্শগত কারণেই জামায়াতের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহকগণের সহযোগী হওয়া সম্ভব ছিল না। যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান বলে সচেতনভাবে বিশ্বাস করে, তারা এ দুটো মতবাদকে তাদের ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনে করতে বাধ্য। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস দলের আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। জামায়াতে ইসলামী তখন থেকেই এ মতবাদের অসারতা বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে। আর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ধর্মহীনতা।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের অতীত আচরণ থেকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে এদেশের এবং মুসলিম জনগণের বন্ধু মনে করাও কঠিন ছিল। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সংগত কারণেই তাদের যে আধিপত্য সৃষ্টি হবে এর পরিণাম মংগলজনক হতে পারে না বলেই জামায়াতের প্রবল আশংকা ছিল।

তৃতীয়ত, জামায়াত একথা বিশ্বাস করত যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে গোটা পাকিস্তানে এ অঞ্চলের প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে। তাই জনগণের হাতে ক্ষমতা বহাল করার আন্দোলনের মাধ্যমেই জামায়াত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল।

চতুর্থত, জামায়াত বিশ্বাস করত যে, প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী দেশটির বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রভুক্ত থাকাই সুবিধাজনক। আলাদা হয়ে গেলে ভারত সরকারের আধিপত্য রোধ

করা পূর্বাঞ্চলের একার পক্ষে বেশি কঠিন হবে। মুসলিম বিশ্ব থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় এ অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রশ্নটি জামায়াতের নিকট উদ্বেগের বিষয় ছিল।

পঞ্চমত, পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পলিসির কারণে এ অঞ্চলে স্থানীয় পুঁজির বিকাশ আশানুরূপ হতে পারেনি। এ অবস্থায় এদেশটি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খপ্পরে পড়লে আমরা অধিকতর শোষণ ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হব বলে জামায়াত আশংকা পোষণ করত।

জামায়াত একথা মনে করত যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতের সাথে সমমর্যাদায় লেনদেন সম্ভব হবে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব জিনিস এখানে আমদানি করা হতো, আলাদা হবার পর সে সব ভারত থেকে নিতে হবে। কিন্তু এর বদলে ভারত আমাদের জিনিস সমপরিমাণে নিতে পারবে না। কারণ রফতানির ক্ষেত্রে ভারত আমাদের প্রতিযোগী দেশ হওয়ায় আমরা যা রফতানি করতে পারি, তা ভারতের প্রয়োজন নেই। ফলে আমরা অসম বাণিজ্যের সমস্যায় পড়ব এবং এদেশ কার্যত ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

ষষ্ঠত, জামায়াত পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা এবং সকল বৈষম্যের অবসান করতে চেয়েছিল। জামায়াতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হলে বে-ইনসাফী, যুলুম ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আসবে।

এসব কারণে জামায়াতে ইসলামী তখন আলাদা হবার পক্ষে ছিল না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এদেশে যারাই জামায়াতের সাথে জড়িত ছিল, তারা বাস্তব সত্য হিসাবে বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে। আজ পর্যন্ত জামায়াতের লোকেরা এমন কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টার সাথে শরীক হয়নি যা বাংলাদেশের আনুগত্যের সামান্য বিরোধী বলেও বিবেচিত হতে পারে। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা বাস্তব কারণেই যোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তারা কোন প্রতিবেশী দেশের আশ্রয় পাবে না। তাই এ দেশকে বাঁচাবার জন্য জীবন দেয়া ছাড়া তাদের কোন বিকল্প পথ নেই।

জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতে পূর্বপাকিস্তানের সমস্যা কী ছিল?

যে কোন সমস্যারই একাধিক বিশ্লেষণ হতে পারে এবং সমাধানের ব্যাপারেও আন্তরিকতার সাথেই মতপার্থক্য থাকতে পারে। জামায়াতে ইসলামী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছে, তা যদি কেউ নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করে, তাহলে একথা উপলব্ধিকরা সহজ হবে যে, জামায়াত কেন বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করা প্রয়োজন মনে করেনি। এ বিষয়ে জামায়াতের সাথে কেউ একমত হোক বা না হোক, জামায়াতের দৃষ্টিভংগিকে ভালভাবে বুঝতে পারবে।

জামায়াত কখনও সুবিধাবাদের রাজনীতি করে না এবং কোন প্রকারে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিও জামায়াত করে না। ইসলামী জীবন বিধানকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই জামায়াত কাজ করে যাচ্ছে।

জামায়াত স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে না বলে দেশকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলবার যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি না করে ক্ষমতা গ্রহণে মোটেই আগ্রহী নয়। তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জামায়াতের বিরুদ্ধে ৭১-এর ভূমিকা সম্পর্কে যত অপপ্রচারই চালান হোক, তাতে কারো কোন উপকার হবে না। যারা ধীরচিত্তে জামায়াতের দৃষ্টিভংগিকে বুঝতে চান, তাদের জন্যই এদেশের সমস্যা সম্পর্কে নিম্নরূপ বিশ্লেষণ পেশ করা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান কায়েম হয়, তখন বর্তমান বাংলাদেশের এলাকা সবচাইতে অনুন্নত ছিল। যেমন ঃ

১। সশস্ত্র বাহিনীতে এ অঞ্চলের লোক ছিল না বললেই চলে।

২। পুলিশ বাহিনীতেও খুব কম লোকই ছিল। তাই ভারত থেকে যে সব মুসলমান পুলিশ অপশন দিয়ে এসেছিল, তারাই প্রথম দিকে থানাগুলো সামলিয়েছিল।

৩। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী মাত্র গুটিকয়েক ছিলেন।

৪। ২/৩ টা কাপড়ের কারখানা ছাড়া শিল্প কিছু ছিল না। এ এলাকার পাটেই কোলকাতার পাটকল চলতো। এখানে পাটের কারখানা ছিল না।

৫। বিদেশের সাথে বাণিজ্য করার যোগ্য একটা সামুদ্রিক বন্দরও এখানে ছিল না।

৬। কোন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না।

৭। ঢাকা শহর একটা জেলা শহর ছিল মাত্র। প্রাদেশিক রাজধানীর অফিস ও কর্মচারীদের জন্য বাঁশের কলোনী তৈরি করতে হয়েছে। আর ইডেন মহিলা কলেজ বিল্ডিংকেই সেক্রেটারীয়েট (সচিবালয়) বানাতে হয়েছে।

বংগভংগ আন্দোলন

এ দুরবস্থার প্রধান কারণ এটাই ছিল যে, পূর্ব বাংলাকে বৃটিশ আমলে কোলকাতার পশ্চাদভূমি (হিন্টারল্যান্ড) বানিয়ে রাখা হয়েছিল। এখানকার চাউল, মাছ, মুরগী, ডিম, দুধ, পাট ও যাবতীয় কাঁচামাল কোলকাতার প্রয়োজন পূরণ করত। আর কোলকাতার কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য এখানকার বাজারে বিক্রয় হতো। তদুপরি শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি অমুসলিমদেরই কুক্ষিগত ছিল।

ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানরা নিজেদের এলাকার ও এর অধিবাসীদের উন্নয়নের প্রয়োজনে ঢাকাকে রাজধানী করে একটি আলাদা প্রদেশ করার আন্দোলন চালায়, যাতে কোলকাতার শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে এ এলাকাটি উন্নতি করতে পারে। এ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে ইংরেজ সরকার ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববংগ ও আসাম এলাকা নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে। ১৯০৬ সালে এ নতুন প্রাদেশিক রাজধানীতে নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এ সম্মেলনে গোটা ভারতবর্ষের বড় বড় মুসলিম নেতা যোগদান করায় ঢাকার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

বংগভংগ বাতিল আন্দোলন

এ নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য, প্রভাব ও উন্নতির যে বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিল, তাতে কোলকাতার কায়েমী স্বার্থে তীব্র আঘাত লাগল। অমুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য পেশাজীবীগণ "বাংলা-মায়ের দ্বিখণ্ডিত" হওয়ার বিরুদ্ধে চরম মায়াকান্না জুড়ে দিলেন। অখণ্ড মায়ের দরদে তারা গোটা ভারতে তোলপাড় সৃষ্টি করলেন।

এ আন্দোলনে ব্যারিস্টার আবদুর রাসুলের মতো কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবীও শরীক হয়ে অখণ্ড বাংলার দোহাই দিয়ে বংগভংগের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েন। এ আন্দোলনের পরিণামে ১৯১১ সালে বংগভংগ রহিত হয়ে পূর্ব বাংলা আবার কোলকাতার লেজুড়ে পরিণত হয়। যদি বংগভংগ রহিত না হতো, তাহলে ১৯৪৭ সালে ঢাকাকে একটি উন্নত প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে এবং চট্টগ্রামকে পোর্ট হিসাবে রেডী পাওয়া যেত। তাছাড়া শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানরা এগিয়ে যাবার সুযোগ এবং এ এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে উঠত।

মজার ব্যাপার এই যে, ১৯৪৭ সালে গোটা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রবল দাবিতে বৃটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে পশ্চিমবংগকে ভারতের হাতে তুলে দিল। যে অমুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯১১ সালে বংগভংগ রহিত করিয়েছিলেন, তারাই ১৯৪৭ সালে বংগভংগ করিয়ে ছাড়লেন। স্বার্থ বড় বালাই!

পূর্ব বাংলার উন্নয়ন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার পরই পূর্ববাংলার সার্বিক উন্নয়ন শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস ইত্যাদিতে মুসলমান অফিসার নিয়োগ শুরু হলো। অগণিত পদে মুসলিম যুবকরা ব্যাপকভাবে চাকরি পেতে লাগল। এমনকি সশস্ত্র বাহিনীতেও বেশ সংখ্যায় লোক ভর্তি হবার সুযোগ এলো।

অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ময়দানে অমুসলিমদের স্থানে মুসলিমদের অগ্রযাত্রা শুরু হলো। ভারত থেকে হিজরাত করে আসা লোকেরাই অমুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে বিনিময়ের ভিত্তিতে দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করল। শিল্প-কারখানার পুঁজি এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে মুহাজিররাই এ এলাকার উন্নয়নে লেগে গেল।

যদি পাকিস্তান না হতো এবং আমরা যদি অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্তই থাকতাম, তাহলে আজ স্বাধীন বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। এ অবস্থায় এ এলাকার মুসলমানদের কী দশা হতো তা কি আমরা ভেবে দেখি? আজ যারা জেনারেল, তাদের কয়জন নন-কমিশন অফিসারের উপর কোন স্থান দখল করার সুযোগ পেতেন? সেক্রেটারীর মর্যাদা নিয়ে আজ যারা সচিবালয়ে কর্তৃত্ব করছেন, তাদের কতজন সেকশন অফিসারের উর্ধ্বে উঠতে পারতেন? আজ যারা পুলিশের বড় কর্তা, তারা দারোগার বেশি হতে পারতেন কী?

মুসলিম নামের অধিকারী হয়েও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বড় বড় মর্যাদার আসন অলংকৃত করছেন, তাদের কি এ সুযোগ ঘটতো? ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের যে বাহিনী এখন বিদেশে পর্যন্ত বিরাট সুযোগ পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে শতকরা কতজন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করতেন?

বাংলাদেশে এখন যেসব শিল্প-কারখানা রয়েছে পাকিস্তান না হলে তা কি সম্ভব হতো? আজ যারা বড় বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন, তারা মাড়োয়ারীদের দাপটে কি মাথা তুলতে পারতেন?

আজ বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে পরিচিত। পাকিস্তান হয়েছিল বলেই এটুকু পজিশন সম্ভব হয়েছে। তা না হলে আমরা ভারতের একটা প্রদেশের অংশ হয়েই থাকতে বাধ্য হতাম। একটা পৃথক প্রদেশের মর্যাদাও পেতাম না।

কেন সার্বিক উন্নয়ন হলো না?

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পূর্ব বংগের সার্বিক উন্নয়ন না হওয়ার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারই প্রধানত দায়ী। ইংরেজ চলে যাবার পর প্রশাসনিক কর্মকর্তা হয়ে যারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করলেন, তাদের মধ্যে পূর্ববংগের কোন বড় কর্মকর্তা ছিল না। আর পাকিস্তান আন্দোলনের যেসব নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন, তাদের মধ্যে পূর্ববংগের যারা প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তারা এত অনভিজ্ঞ ও দুর্বল ছিলেন যে, পূর্ববংগের উন্নয়নের ব্যাপারে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা করণীয় ছিল তার সামান্য কিছুই আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

বৃটিশ আমলে পূর্ববংগ চরমভাবে অবহেলিত থাকার দরুন এ অঞ্চল শিল্প-বাণিজ্য, সেচ প্রকল্প, বন্দর-সুবিধা, কৃষি-উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, পেশাগত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক অনুন্নত ছিল। এ অবস্থায় পূর্ববংগের উন্নয়নের প্রতি শুরু থেকেই বিশেষ মনোযোগ দেয়া কর্তব্য ছিল। এ কর্তব্য পালন করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এখানকার জনগণের এমন আস্থা সৃষ্টি হতো, যা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় করতে সক্ষম হতো।

পূর্ববংগের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার জন্য শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমাদের নিজেদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতা ঢেকে রাখার যারা চেষ্টা করে আমরা তাদের সাথে একমত নই।

যারা নিজেদের পশ্চাদগামিতার জন্য শুধু অপরকে দোষী সাব্যস্ত করেই আপন দায়-দায়িত্ব শেষ করে, তারা নিজেদের দোষ ও ভুল দেখতে পায় না। তাদের পক্ষে সত্যিকার উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হয় না। পাকিস্তান

হবার পর এ এলাকার জনগণের অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন না হওয়া এবং যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে, তা দ্রুত না হওয়ার জন্য পাকিস্তানীদের উপর দোষ চাপাবার প্রবণতা এত প্রবল ছিল যে, সব ব্যাপারেই শুধু পশ্চিমের শোষণের দোহাই দেয়া হতো।

নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের যোগ্যতা না থাকলে এক মায়ের পেটের ভাই-এর কাছেও ঠকতে হয়। যে ভাই ঠকায়, সে নিশ্চয়ই দোষী।

কিন্তু সে তার স্বার্থ যেমন বুঝে নিচ্ছে, অপর ভাইও যদি নিজের অধিকার আদায় করার যোগ্য হয়, তাহলে আর ঠকতে হয় না।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল নিঃস্বার্থ, জনদরদী, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। পূর্ব পাকিস্তানের উপর যত অবিচার হয়েছে এর জন্য প্রধানত দায়ী এখানকার ঐসব নেতা, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের শরীক থেকেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেননি। বিশেষ করে আইয়ুব আমলে যারা মন্ত্রিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পেয়ে গণতন্ত্রের বদলে একনায়কত্বকে সমর্থন করেছিলেন, তারা এদেশের জনগণকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সাথে সাথে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পংগু করে রাখার জন্যও বিশেষভাবে দায়ী।

নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের জন্য যারা শুধু লর্ড ক্লাইভকে গালি দেয়, তাদের সাথে একমত হওয়া যায় না। ক্লাইভ তার জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মীর জাফরের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই যে আমরা পরাধীন হয়েছিলাম, তা থেকে শিক্ষা আজও আমরা নিচ্ছি না। পশ্চিম পাকিস্তানের “ক্লাইভদের” চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের “মীরজাফররাই” যে আমাদের অবনতির জন্য অধিকতর দায়ী, সে কথা উপলব্ধি না করার ফলে আজও আমাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের অভাব

সত্যিকার আদর্শবান, নিঃস্বার্থ, জনদরদী, চরিত্রবান ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে না। আমাদের দেশে কোন পলিটিকেল সিস্টেম গড়ে ওঠার লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এখানে রাজনীতি করা মানে যে-কোন উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা।

দলীয় নেতৃত্বের আসন দখল করাই রাজনৈতিক দল গঠনের একমাত্র লক্ষ্য। ঐ আসন বেদখল হয়ে গেলে দল ভেংগে হলেও নেতা হবার নীতি এদেশে প্রচলিত হয়ে গেছে।

গণতন্ত্রের শ্লোগান আমাদের দেশে একনায়করাই বেশি জোরে দিয়ে থাকে। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারায় যেন পার্থক্য স্পষ্ট নয়।

এধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ আছে বলেই সেনাপতিরাও ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল গঠন করার ডাক দিলে গণতন্ত্রের বহু তথাকথিত ধ্বজাধারী একনায়ককেই গণতন্ত্রের নায়ক হিসাবে মেনে নেয়।

নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব থাকলে জনগণের সব অধিকারই অর্জন করা সম্ভব হতো। আর ঐ জিনিসের অভাব থাকায় বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দুর্দশা বেড়েই চলেছে।

নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ঃ

১। নিষ্ঠার সাথে গণতন্ত্রের আদর্শ মেনে চলার অভ্যাস।

২। সরকারী ও বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে সত্যিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন।

৩। দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলবার ব্যবস্থা।

৪। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধান।

৫। যারা বিনা নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করে, তাদেরকে গণতন্ত্রের দুশমন মনে করা এবং তাদের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করা।

যারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শরীক হয়নি তারা কি স্বাধীনতা বিরোধী ছিল?

১৯৭০-এর নির্বাচনের দীর্ঘ অভিযানে শেখ মুজিব প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় জনগণকে আশ্বাস দিয়েছে যে, "আমরা ইসলাম বিরোধী নই" এবং "আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাই না"। জনগণ তাকে ভোট দিয়েছিলেন তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন মেন্ডেট তিনি নেননি। নির্বাচনের পরও এ জাতীয় সুস্পষ্ট কোন ঘোষণা তিনি দেননি।

তাই ১৯৭১-এ যারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শরীক হয়নি, তারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল না। ভারতের অধীন হবার ভয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের খপ্পরে পড়ার আশংকাই তাদেরকে ঐ আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল। তারা তখনও অখণ্ড পাকিস্তানের নাগরিকই ছিল। তারা রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত ছিল না বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করেনি। নিজ দেশের কল্যাণ চিন্তাই তাদেরকে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কাজ করেছে। তাই আইনগত ভাবে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

নৈতিক বিচারে ব্যক্তিগতভাবে যারা নরহত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও অন্যান্য অন্যায় করেছে, তারা অবশ্যই নরপশু। যাদের চরিত্র এ জাতের, তারা আজও ঐসব করে বেড়াচ্ছে। পাক সেনাবাহিনীর যারা এ জাতীয় কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তারাও নরপশুদেরই অন্তর্ভুক্ত। যাদের কোন ধর্মবোধ, নৈতিক চেতনা ও চরিত্রবল নেই, তারা এক পৃথক শ্রেণী। পাঞ্জাবী হোক আর বাংগালী হোক, এ জাতীয় লোকের আচরণ একই হয়।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বাধীনতাবিরোধী হওয়া এক কথা নয়

অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলনে কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের মতবিরোধকে কতক কংগ্রেস নেতা স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রচার করত। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাবী করতো এবং গোটা ভারতকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ জানত যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ইংরেজের গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েও মুসলমানদেরকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীন থাকতে হবে। তাই ঐ স্বাধীনতা দ্বারা মুসলমানদের মুক্তি আসবে না। তাই মুসলিম লীগ পৃথকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চালালো এবং ভারত বিভাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পাকিস্তান দাবী করল। ফলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন একই সংগে ইংরেজ ও কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেল।

কংগ্রেস নেতারা তারস্বরে মুসলিম লীগ নেতাদেরকে ইংরেজের দালাল ও দেশের স্বাধীনতার দুশমন বলে গালি দিতে লাগল। কংগ্রেসের পরিকল্পিত স্বাধীনতাকে স্বীকার না করায় মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার বিরোধী বলাটা রাজনৈতিক গালি হতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য হতে পারে না।

ঠিক তেমনি যে পরিস্থিতিতে ভারতের আশ্রয়ে বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, সে পরিবেশে যারা ঐ আন্দোলনকে সত্যিকার স্বাধীনতা আন্দোলন বলে বিশ্বাস করতে পারেনি, তাদেরকে স্বাধীনতার দুশমন বলে গালি দেয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যতই প্রয়োজনীয় মনে করা হোক, বাস্তব সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

বিশেষ করে স্বাধীনতার নামে প্রদত্ত শ্লোগানগুলোর ধরন দেখে ইসলামপন্থীরা ধারণা করতে বাধ্য হয় যে, যারা স্বাধীন বাংলাদেশ বানাতে চায়, তারা এদেশে ইসলামকে টিকতে দেবে না, এমনকি মুসলিম জাতীয়তাবোধ নিয়েও বাঁচতে দেবে না। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও

বাংগালী জাতীয়তাবাদের (মুসলিম জাতীয়তার বিকল্প) এমন তুফান প্রবাহিত হলো যে, মুসলিম চেতনাবোধসম্পন্ন সবাই আতংকিত হতে বাধ্য হলো। এমতাবস্থায় যারা ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারল না, তাদেরকে দেশের দুশমন মনে করা একমাত্র রাজনৈতিক হিংসারই পরিচায়ক। ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারতের অধীন হবার আশংকা যারা করেছিল, তাদেরকে দেশপ্রেমিক মনে না করা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক মরহুম আবুল মনসুর আহমদ দৈনিক ইত্তেফাক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ এত কিছু লিখে গেছেন, যা অন্য কেউ লিখলে হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে শাস্তি পেতে হতো। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে পরাজিত পক্ষকে বিজয়ী পক্ষ দেশদ্রোহী হিসাবে চিত্রিত করার চিরাচরিত প্রথা সাময়িকভাবে গুরুত্ব পেলেও স্থায়ীভাবে এ ধরনের অপবাদ টিকে থাকতে পারে না।

আজ এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবিদার কিছু নেতা ও দলকে দেশের জনগণ বর্তমান ভারতের দালাল বলে সন্দেহ করলেও বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেনি, সে সব দল ও নেতাদের সম্পর্কে বর্তমানে এমন সন্দেহ কেউ প্রকাশ করে না যে, এরা অন্য কোন দেশের সহায়তায় এ দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিতে চায়।

তারা গোটা পাকিস্তানকে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে রক্ষা করা উচিত বলে বিবেচনা করেছিল। তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশ পৃথক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবার পর তারা নিজের জন্মভূমি ছেড়ে যায়নি। যদি বর্তমান পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে ভৌগোলিক দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠ হতো, তাহলেও না হয় এ সন্দেহ করার সম্ভাবনা ছিল যে, তারা হয়তো আবার বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। তাহলে তাদের ব্যাপারে আর কোন্ প্রকার সন্দেহের কারণ থাকতে পারে? বাংলাদেশকে স্বাধীন রাখা এবং এ দেশকে রক্ষা করার লড়াই করার গরজ তাদেরই বেশী থাকার কথা।

বাংলাদেশের নিরাপত্তার আশংকা একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই হতে পারে। তাই যারা ভারতকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে করে, তারাই হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। কিন্তু যারা ভারতের প্রতি অবিশ্বাসের দরুন '৭১ সালে বাংলাদেশকে ভারতের সহায়তায় পৃথক

রাষ্ট্র বানাবার পক্ষে ছিল না, তারাই ভারতের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জীবন দেবে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হওয়ার মানসিক, আদর্শিক ও ঈমানী প্রেরণা তাদেরই, যারা এদেশকে একটি মুসলিম প্রধান দেশ ও ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়।

পশ্চিমবংগের বাংগালীদের সাথে ভাষার ভিত্তিতে যারা বাংগালী জাতিত্বের ঐক্যে বিশ্বাসী, তাদের দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকে থাকার আশা কতটা করা যায় জানি না। কিন্তু একমাত্র মুসলিম জাতীয়তাবোধই যে বাংলাদেশের পৃথক সত্তাকে রক্ষা করতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মুসলিম জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিতদের হাতেই বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা সবচেয়ে বেশী নিরাপদ।

শেরে বাংলার উদাহরণ

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সে ঐতিহাসিক দলিলের প্রস্তাবক ছিলেন। অথচ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে এক ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরের সাথে হাত মিলান এবং পাকিস্তান ইস্যুতে ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন হয়, তাতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেন। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর তিনি কোলকাতায় নিজের বাড়ীতে সসম্মানে থাকতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতো ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হতে পারতেন। কিন্তু যখন পাকিস্তান হয়েই গেল, তখন তাঁর মতো নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক কিছুতেই নিজের জন্মভূমিতে না এসে পারেন নি। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও এদেশের জনগণ শেরে বাংলাকে পাকিস্তানের বিরোধী মনে করেনি। তাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তাঁরই নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের উপর এত বিরাট বিজয় লাভ করে। অবশ্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে গালি দিয়ে তাঁর প্রাদেশিক সরকার ভেংগে দেয়। আবার কেন্দ্রীয় সরকারই তাঁকে প্রথমে গোটা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরও নিযুক্ত করে। এভাবেই তাঁর মতো দেশপ্রেমিককেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রদ্রোহী বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর উদাহ্‌রণ

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম বড় নেতা ছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে যখন বংগদেশ পূর্ববংগ ও পশ্চিমবংগে বিভক্ত হয়, তখন গোটা বংগদেশ ও আসামকে মিলিয়ে "গ্রেটার বেংগল" গঠন করার উদ্দেশ্যে তিনি শরৎ বসুর সাথে মিলে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হলে পূর্ববংগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো না। তিনি পশ্চিমবংগের লোক। পশ্চিমবংগের বিপুল সংখ্যক মুসলমানের স্বার্থরক্ষা এবং কোলকাতা মহানগরীকে এককভাবে হিন্দুদের হাতে তুলে না দিয়ে বাংলা ও আসামের মুসলমানদের প্রাধান্য রক্ষাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি পূর্ববংগে আসেন, তখন তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে পাকিস্তানের দুশমন বলে ঘোষণা করা হয় এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য তিনিই পরে পাকিস্তানের উযিরে আযম হবারও সুযোগ লাভ করেন। বলিষ্ঠ ও যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার প্রয়োজনে দুর্বল নেতারা এ ধরনের রাজনৈতিক গালির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের গালি দ্বারা কোন দেশপ্রেমিক জননেতার জনপ্রিয়তা খতম করা সম্ভব হয়নি।

তাই '৭১-এর ভূমিকাকে ভিত্তি করে যে সব নেতা ও দলকে "স্বাধীনতার দুশমন" ও "বাংলাদেশের শত্রু" বলে গালি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যতই বিষোদগার করা হোক, তাঁদের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও জনপ্রিয়তা ম্লান করা সম্ভব হবে না।

এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা?

বাংলাদেশ একটি পৃথক স্বাধীন দেশ হিসাবে কায়েম হবার দেড় যুগ পরেও যারা '৭১-এর ভূমিকা নিয়ে হৈচৈ করার চেষ্টা করেন, তারা একটা কথা গভীরভাবে বিবেচনা করেননি।

'৭১-এর ভূমিকার কারণে যারা এদেশে ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থী হিসাবে চিহ্নিত, তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ হবার পর এমন কোন কাজ হয়েছে কি, যা এদেশের স্বাধীনতার সামান্য বিরোধী বলে প্রমাণ করা যায়?

একথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, এদেশের স্বাধীনতার উপর যদি কোথাও থেকে আঘাত আসে, তা একমাত্র ভারত থেকেই আসতে পারে। দেশের চারপাশে যদি ভারত ছাড়া আরও কয়েকটি দেশ থাকত, তাহলে এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের সুযোগ হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের ভূমিকার কারণে যারা এ বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখতে চান, তারা জনগণ থেকে ভিন্ন চিন্তা করেন। জনগণকে বাদ দিয়ে দেশরক্ষা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণ ভারত সরকারকে বন্ধু মনে করে না। তাদের কোন আচরণই বন্ধুসুলভ বলে প্রমাণিত নয়। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের ভূমিকাকেও এদেশের মংগলের নিয়তে পালন করা হয়েছে বলে জনগণ বিশ্বাস করে না।

সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্যই হলো প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্স। "ডিফেন্স এগেইনস্ট হুম" বা "কার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা" প্রশ্নটি আপনিই মনে জাগে। যেহেতু একমাত্র ভারত থেকেই আক্রমণের সম্ভাবনা, সেহেতু এ প্রশ্নের জওয়াবও একটাই।

তাছাড়া শুধু সশস্ত্র বাহিনী দিয়েই দেশ রক্ষা হয় না। জনগণ যদি সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে না দাঁড়ায়, তাহলে সে বাহিনী কিছুতেই প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। জনগণও একথা বিশ্বাস করে যে, এদেশের

স্বাধীনতা তাদের হাতেই নিরাপদ, যারা ভারতকে আপন মনে করে না এবং ভারতও এদেশে যাদেরকে তার আপন মনে করে না। তাই '৭১-এর ভূমিকা দ্বারা যারা এদেশে ভারতের বন্ধু নয় বলে প্রমাণিত, তারা জনগণের আস্থাভাজনই আছে। যারা বিশেষ রাজনৈতিক গরজে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন, তারা এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে কোন সমর্থন যোগাড় করতে পারবেন না।

এদেশের জনগণ ভারত সরকারকে বন্ধু মনে করে না বলেই রাশিয়াকেও আপন মনে করে না। কারণ, রাশিয়ার নীতি সব সময়ই ভারতের পক্ষে দেখা গেছে। তাছাড়া, রুশ-দূতাবাসের কার্যকলাপ সম্পর্কে মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর প্রকাশিত হয়, তাতে তাদের সম্পর্কে সুধারণা সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে আফগানিস্তানে রাশিয়ার নির্লজ্জ ভূমিকা গণমনে তীব্র ঘৃণাই সৃষ্টি করেছে।

এদেশে কারা রাশিয়ার আগ্রাসী ভূমিকাকে সমর্থন করে এবং কারা ভারতের নিন্দনীয় ভূমিকাকে নীরবে সমর্থন করে, তা কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়। সুতরাং তারা যখন জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে '৭১-এর ভূমিকার দোহাই দিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়, তখন তাদের নিজেদের হীন মতলবই ফাঁস হয়ে পড়ে। তাদের এ চিৎকারের অর্থ দেশপ্রেমিক জনগণের বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

এদেশের জনগণ একথা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে যে, '৭১-এ যারা ভারতবিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে, তারা কোন অবস্থায়ই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের উপর কোন হস্তক্ষেপ বরদাশত করবে না। আর যারা এদেশে ইসলামকে বিজয়ী দেখতে চায়, তারাই দেশরক্ষার জন্য প্রাণ দেবার বেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং '৭১-এর ভূমিকার ভিত্তিতে তাদের দেশপ্রেমকে যারা কটাক্ষ করে, তারা প্রতিবেশী দেশের সম্প্রসারণবাদী সরকারের বন্ধু বলেই জনগণের নিকট বিবেচিত হবে।

আর একটা বাস্তবতা হলো এই যে, এদেশে কোন গৃহযুদ্ধ লাগলেও যারা ভারতের কোন আশ্রয় আশা করে না, তারাই এদেশকে রক্ষা করবে। যাদের আর কোথাও যাবার পথই নেই, তারাই মরিয়া হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য

এগিয়ে আসবে। কারণ, এছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। তাদের জীবন ও মরণ এদেশেই নির্ধারিত যারা সব সময় ভারতের আধিপত্যবাদী ভূমিকার বিরোধী তাদেরকেই জনগণ এদেশে স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষক বলে মনে করে। দেশে কোন বড় রকমের রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে যারা ভারত সরকারের মেহমান হিসাবে সে দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পান, তারা কী করে আশ্রয়দাতা দেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন? এদেশ ছাড়াও যাদের আশ্রয় আছে, তারা কি এদেশের হিফাযত করতে পারবেন?

'৭১-এর রাজনৈতিক মতপার্থক্য এখন অবান্তর। তখন এমন এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, দেশপ্রেমিকদের মধ্যে দেশের কল্যাণ কোন পথে সে বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেল। এক পক্ষ মনে করল যে, পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। অপর পক্ষ মনে করল যে, পৃথক হলে ভারতের খপ্পরে পড়তে হবে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে "পাঞ্জাবের দালাল" আর "ভারতের দালাল" মনে করত। কিন্তু এসব গালি দ্বারা কোন্ পক্ষের দেশপ্রেমই মিথ্যা হয়ে যায় না। ঐ সময়কার দুঃখজনক মতবিরোধকে ভিত্তি করে যদি এখনও বিভেদ জারী রাখা হয়, তাহলে জাতি হিসাবে আমরা ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যেতে বাধ্য হব।

শেষ কথা

দুনিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কায়েম হবার পর সব ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তি স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের জন্মভূমিতে সাধ্যমত ইসলামের খেদমত করার চেষ্টা করছে। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার ধ্বনি স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৭ সালে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ খতম করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও দৃঢ় আস্থা এবং সমাজতন্ত্রের ভিন্ন ব্যাখ্যা সংবিধানে সন্নিবেশিত করার পর জনগণ রেফারেন্ডামের মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানাবার ফলে ইসলামপন্থী দলগুলো বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত

করার জন্য শাসনতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এদেশের মুসলমানদের জন্য তাদের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা এলাকা। আর কোন মুসলিম দেশ এমন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নেই। তদুপরি আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমিটি এমন একটি দেশ দ্বারা বেষ্টিত, যাকে আপন মনে করা মুশকিল। তাই এদেশের আযাদীর হিফাযত করা সহজ ব্যাপার নয়। জনগণ এ ক্ষেত্রে একেবারেই বন্ধুহীন। আশপাশ থেকে সামান্য সাহায্য পাওয়ারও কোন আশা করা যায় না। এ দেশবাসীকে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজেদের শক্তি নিয়েই প্রতিরক্ষার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

যে কোন জাতির আদর্শ ও বিশ্বাসই তার শক্তির উৎস হবে। সুতরাং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনাদর্শ ইসলামই স্বাধীনতার আসল গ্যারান্টি। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামপন্থী সকলেই এ মহান উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। তাই জনগণের নিকট তাদের চেয়ে বেশী আপন আর কেউ হতে পারে না।